অধ্যায় - ২

মনসা দেবীর কথা ও পূজা বৈশিষ্ট্য

মনসা দেবীর কথা-

মনসা সর্পের আভূষণে সজ্জিতা, হংস তঁঅধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি সর্প ার বাহন। দেবী নিজে সর্পরূপা নন, তাঁর অবয়ব মানবীর। প্রাচীন কোন সংস্কৃত পুরাণ, এমনকি পণিনির ব্যাকরণেও ''মনসা'' নামের উল্লেখ নেই। অর্বাচীন সংস্কৃত অভিধানে আছে ''মনসা সৃষ্টা ইতি'' মনসা। তিনি শিবের মানস কন্যা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ''নাগ'' পূজার রীতি আছে। অথর্ববেদে সর্পবিদ্যা পারদর্শিনী এক কিরাত কন্যার কথা পাই। রামায়ণ-মহাভারতেও মনসা নামের উল্লেখ নেই। মহাভারতের আদিপর্বে জরৎকারুর কথা আছে, ইনি বাসুকির ভগ্নী। এঁর স্বামীর নামও জরৎকারু। জৈনদের সর্পদেবী পদ্মাবতী। মহাযান বৌদ্ধধর্মে ''জাঙ্গুলী তারা'' র কথা আছে। 'সাপুড়ে' বোঝাতে বাণভট্ট ''জাঙ্গুলিক'' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। জাঙ্গুলী দেবীর বাহন মনসার মতই হংস। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে দেবীর আর এক নাম 'জাগুলি'। দক্ষিণ ভারতে ওঁরাও দের দেবী মঙ্কাম্মা। ছোটনাগপুরের ওঁরাওরা সাপের ওঝাকে ''নাগমতি'' বলে। মহীশূরে সর্পদেবীর নাম মুদামা। আসামের গোয়ালপাড়া লক্ষীপুর অঞ্চলের 'রাড়া' উপজাতিরা মায়াবন্তী বিষহরির পূজা করেন। আষাঢ় মাসে এরা মাটির 'থাপনা' গড়ে দেবীর পূজা করেন। গাড়ো উপজাতিরা ''মাড়াই'' নামে সর্পদেবীর পূজা করে। মেঘালয়ের তুরা অঞ্চলের (হাজং এ) সর্পদেবী 'মারই'। অন্ধ্রপ্রদেশে 'নাগম্মা'ও 'বালনাগম্মার' সর্প কাহিনী লোক সমাজে প্রচলিত আছে। পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ''মনসা'' নামের উল্লেখ আছে। এই পুরাণগুলি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর আগে রচিত হয়নি। অনুমিত হয় এর অন্ততঃ শতবর্ষ আগে সমাজে মনসাদেবীর পূজা প্রচলিত হয়েছিল (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ২৭৫)। বাংলার মনসামঙ্গলের গল্পও দেবী মনসার পূজা প্রচারের কাহিনীর ওপর আধারিত। আর এই দেবীর পরিকল্পনায় বৌদ্ধ, জৈন, অনার্য দ্রাবিড় তথা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের চিন্তা ও চেতনা জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সংমিশ্রিত হয়েছে। ইনি কেবল সর্পদেবীই নন, উর্বরতা, কৃষিকাজ ও প্রজনন শক্তির সাথে তাঁর যোগ আছে। তিনি শিশুপালিকা গ্রাম-দেবী। ধন ও ঐশ্বর্য প্রদায়িনী ব্রহ্মানী, তিনি বিষহরি, বিষকান্তা। তাঁকে নিয়ে অনেক মিথ! কোথাও মনসা মহাদেবী। ধর্ম ও শিব এর সঙ্গে তাঁর বিচিত্র সম্পর্কসূত্র রচনা করেছে বাংলার মনসামঙ্গল। তিনি অযোনিসম্ভবা আবার নিজেও জন্মেছেন না পুরুষ না স্ত্রী হয়ে। একাধারে তিনি পৌরাণিক আবার লৌকিক। ভারতের সর্বত্র সর্পদেবীর পাথুরে মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। অন্ততঃ ১৫০ জন কবি মনসামঙ্গল গান লিখেছিলেন। কয়েকশ বছর ধরে আসরে আসরে সেই গান গাওয়া হয়েছে। অসংখ্য গায়েন ও লিপিকররা সেই ঐতিহ্যকে লালন করেছেন নিজের হাতে। আর শ্রোতা-পাঠক-দর্শক-গবেষকরা ভক্তি-বিশ্বাস ও ঔৎসুক্য নিয়ে মনসামঙ্গলের চর্চা করে চলেছেন আজও।

মনসা পূজা ও এতদ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য-

আজও সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে মনসা পূজা প্রচালিত আছে। পার্শ্ববর্তী আসাম-বিহার ও উড়িষ্যাতেও মনসা পূজা হয়। বিভিন্ন উপজাতি ও জনজাতি সর্পভয় নিবারণ কারিনীর আরাধনা করে। বাৎসরিকভাবে বিভিন্ন আসরে বা বিবাহ ইত্যাদি পারিবারিক উৎসবে বা মনসাপূজার সময় মনসার ভাসান গান গাওয়া হয়। বিভিন্ন ''গীদাল'' বা গায়েনরা মনসামঙ্গল সুর করে করে গান করে দর্শক-শ্রোতার মন ভরিয়ে তোলেন।

গ্রাম বাংলায় মাটির মূর্ত্তিগড়ে বা থানে মনসা পূজা হয়। কোথাও শিলাতে দেবীর পূজা হয়। কোথাও সিজ

গাছ বা স্নুহী বৃক্ষে মনসা পূজা হয়। মনসার মাটির মূর্ত্তিতে হাতে ও বিভিন্ন জায়গায় অষ্টনাগ দেখি। মনসার অষ্টনাগ হল অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট এবং শঙ্খ। গল্পে লখিন্দরকে কিন্তু দংশন করেছিল কাল নাগিনী। মনসামূর্ত্তির দু-দিকে কোথাও কোথাও মাথার ওপরে দুটো "পরী" মূর্ত্তি থাকে। লোক বিশ্বাস হল এরা "মনসার পরী"। কোথাও কোথাও মূর্ত্তির দুপাশে বেহুলা-লখিন্দর মূর্ত্তি গড়া হয় এবং পূজা হয়। পাথরের মনসা মূর্ত্তির দুপাশে একজন নারী এ একজন পুরুষ মূর্ত্তি দেখেছি। মনসার ডান দিকের পুরুষ মূর্ত্তি শশ্রু ধারী - ইনি মনসার স্বামী জরৎকারুমুনি। বাম দিকের নারী মূর্ত্তিটি "নেতেলা" বা নেতা ধোপিনীর। মূর্ত্তির পায়ের কাছে সিজ গাছ এবং ঘট থাকে।

সাধারণত: শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসাপূজা হয়। তবে কোথাও আষাঢ় বা ভাদ্রমাসেও দেবীর পূজা হয়। এছাড়া "স্বপ্নাদেশে" বা গৃহে কোন উৎসবের প্রাক্কালে মনসাপূজা করা হয়। পূজাতে বলি হয়। ছাগ-কবুতর-ছাড়াও ফলাদি বলির রীতি আছে।

মাটিগাড়ায় (উজ্জ্বল সরকারের বাড়ীতে) স্বপ্নে পাওয়া ছোট্ট মনসার শিলা মূর্ত্তির পূজা হয়। নারায়ণ শিলার মতই এতে নাক-চোখ ইত্যাদি আছে। মন্দির সংলগ্ন স্থানে একটি বিরাটাকৃতি সিজ গাছ আছে। এখানে বলি হয় না। পূজাতে ষাঁড়-পাঁঠা উৎসর্গ করা হয়। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে পূজার দিন বাড়ীতে উনুন জ্বলেনা, সবাই পান্তা ভাত খায়। উল্লেখযোগ্য দুর্গা দশমীতে এমনই দেবীর ভোগে পান্তা ভাত কচুনাক ও ঘী দেবার রীতি আছে। জলপাইগুড়ির রাজবাটির পূজাতে মনসাকে দুর্গার সঙ্গে অভেদ করে ভাবা হয় এবং সেখানে নেতার সঙ্গে একযোগে মনসা মূর্ত্তির পূজা হয়। বহু বাড়ীতে পূজোর দিন "শীতল" (পূর্ব দিনের বাসি) খাবার রীতি আছে। এর সঙ্গে শীতল ষষ্ঠীর মিল আছে। কোথাও কোথাও পূজা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বাড়ীতে অরন্ধন পালিত হয়। বহু জায়গায় পূজান্তে মূর্ত্তি বিসর্জন দেওয়া হয় না। সারা বছর ঘরে রেখে ফুল জল দেওয়া হয়। পরের বছর নূতন ঠাকুর এলে পুরনোটি গাছের তলায় বা ঘরের পাশে রেখে দেওয়া হয়। রোদ-বৃষ্টিতে গলে গলে মূর্ত্তি বিলীন হয়। বহু বাড়ীতে বাস্তুপূজার মত মনসার থান আছে।

বাংলার মনসামঙ্গল কাব্যে তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব আছে। অথর্ববেদে যে কিরাত কন্যার কথা আছে তিনি বিষবিদ্যায় পারদর্শিনী। সাপের ওঝারা তাবিজ-কবচ দেয় ও বিষ ঝাড়ার কাজ করে। মন্ত্রোচ্চারণ ও জরি-বুটি এদের পেশার অঙ্গ। কোন কোন সাপ এর ফণার ওপর "আঠালি"র মত পোকা হয়। সাপুড়েরা একে "মণি কিরণী" কলে। একে সৌভাগ্যের চিহ্ন হিসাবে গণ্য করা হয়। সাপুড়েরা মন্ত্র পড়ে এই "মণি কিরণী" বিক্রি করে, যা ধন-অর্থ ও সৌভাগ্য এনে দিতে পারে বলে লোক বিশ্বাস। Karnika > অর্ধতৎসম Karani > তদ্ভব Kari - থেকে শব্দটি এসেছে। উল্লেখযোগ্য মনসার আর এক নাম কাণি। চাঁদ তাঁকে "চেঙমুড়ি কানি" বলেছেন বার বার। উত্তরবঙ্গে আজও কাণি বিষহরির গান প্রচলিত আছে। সুকুমার সেন লিখেছেন - "It may be a derivative of the name of an apsaras also occuring in Kalakarnika or Kalakarni , a name of personified ill suck . . .The name Kani occurs with the epithet 'Cengamuri'. . ." (Edited Manasa-Vijaya, Introduction pg.-xxxiii) বস্তুতঃ "কাণি" নামটি সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের সাথে সম্পর্কিত।

মনসা পূজার সঙ্গে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার যোগ অতি ঘনিষ্ট। একসময় উত্তর ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কমতে শুরু করলে তা বাংলাদেশে বিরাজ করেছে। "হাজার বছরের পুরনো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা" তেই বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ধরা আছে। বাংলাদেশ ও আসাম হল তন্ত্রের পীঠস্থান। "কামাখ্যা-সিরিহট্ট-পূর্ণগিরি ও উড্ডিয়ান" বজ্রযোগিনী পূজার জন্য বিখ্যাত ছিল। আদিতম মঙ্গলকাব্য মনসামঙ্গলেও তন্ত্রের প্রভাব অতি স্পষ্ট। বিশেষতঃ দেবী মনসার পরিকল্পনা ও পূজা পদ্ধতির অনেকখানি তান্ত্রিকতার সাথে মিলে যায়। মন্ত্রজাত, পূজায় বলিদান প্রথা ও কাহিনীতে জীবন-মৃত্যু ও পুনর্জীবনের যে গল্প তা তন্ত্রচার সমর্থিত। কেন্দুলীর (Kenduli) র চন্ডী মন্দিরে (Chandi

Temple) Ambalika (Nagini) নামে একাদশ দ্বাদশ শতকের একটি মূর্ত্তি আছে। তার মাথাতেও সাতটি ফনা যুক্ত সাপ ও ওপরে মনসার পরীর মত দুটি পরী আছে। (Marg পত্রিকা, National Centre for the performing Arts, March 2001, 52 vol. 3 Number)। সুতরাং সর্পভাবনা ও দেবী মূর্ত্তি কল্পনার মধ্যে সারা ভারতবর্ষে একটি মানদন্ড গড়ে উঠেছিল। একে মাতৃ সাধনার ধারা বলতে পারি। এই সাধনা তন্ত্র সাধনার সঙ্গে সম্পর্কিত।

এতদ্ অঞ্চলে কুষাণ গান প্রচলিত আছে। আছে বিষহরা। কোথাও কোথাও বেহুলা-লখিন্দরের জনপ্রিয় কাহিনী নিয়ে লোকনাটক পরিবেশিত হয়। বাণগড়ের বাণ রাজকন্যার সঙ্গে ঊষা-অনিরুদ্ধর কাহিনীকে একাকার করে লোকগান গাওয়া হয়। "কুশানের মতই . . . গীদাল-দোহারী বা বৈরাগী, দোহার, ছৌকরা, ছুকরী, অভিনয় সহযোগী শিল্পী ও বাদ্যযন্ত্রীদের নিয়ে বিষহরার দল তৈরী হয়। সাপ এর মত করে নাচতে হয় বলে বিষহরার নাচ বেশ কষ্টকর। দলে ২০-২৫ জন শিল্পী থাকে। (মানিক সরকার উত্তরবঙ্গের লোক সংস্কৃতিতে লোকনাট্য, লোকসংস্কৃতি উৎসব স্মরণিকা ১৯৮৩, পৃ. ৬-৭), এই গানের প্রাণ হল এর লৌকিক সুর। গীদালের হাতে চামর থাকে। সঙ্গে থাকে কুপা-বাঁশী ও মুখাবাঁশী নামে বিশেষ একরকম বাঁশী, যা সাপ খেলানো সুরের সংস্কারকে মনে করিয়ে দেয়। বিষহরা তাই লৌকিক দেবীকেন্দ্রিক মনসা মঙ্গলের কাহিনী, যা মনসাকে নিয়ে গড়ে ওঠা কয়েকশ বছরের ঐতিহ্যকে জাতীয় মর্যাদা এনে দিয়েছে। পরিশেষে সহমত হয়ে বলতে চাই - "The myth and the cult of Manasa are inextricably mixed up together. It may be pointed out here that Manasa is a dual duty; the goddess of life cure and prosperity and the demoness of death, decay and misfortune" (Edited Manasa-Vijaya, Sukumar Sen, Introduction pg. xxix)। বস্তুতঃ এই বৈপরীত্যই দেবী মনসাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে আর মনসামঙ্গলকে মহাকাব্যের মর্যাদা দান করেছে।